বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সুজনের আহ্বান

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক (৩১/১০/১৩)

বহুলাংশে ইতিহাসেরই যেন আবার পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলছে। ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিরোধের কারণে ঢাকায় ছয়জনের প্রাণহানি ঘটে। এবার ৬০ ঘন্টার হরতালে প্রাণ দিতে হল ১৮ থেকে ২০ জনকে। গতবার ছিল 'লগি-বৈঠার' আন্দোলন, এবার হল 'দা-কুড়ালের' প্রতিউত্তরের হুমকি। তবে গতবারের সঙ্গে এবারের পার্থক্য হল যে, এবার সারাদেশে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছে এবং ব্যাপকভাবে ককটেলের ব্যবহার ঘটেছে। ককটেলের জবাব যেন ককটেল দিয়েই দেওয়া হয়েছে। আর ককটেল পড়ছে যত্রতত্র, যে কারণে সকল নাগরিকেরই নিরাপত্তা হুমকির মুখে। এছাড়াও গতবার সংঘর্ষ হয়েছে দুই জোটের মধ্যে, কিন্তু এবারকার সংঘর্ষ ত্রিমুখী, মহাজোট ও ১৮-দলীয় জোট সমর্থক এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে। বর্তমান পরিস্থিতিতে নাগরিক হিসেবে আমরা উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত।

অনেক নাগরিকের মত দুই নেত্রীর মধ্যে অনুষ্ঠিত ফোনালাপে আমরাও আনন্দিত হয়েছিলাম। আমরাও ভেবেছিলাম যে, আমাদের দুই প্রধান দলের মাঝখানের বরফ গলা শুরু হয়েছে এবং পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা নিয়ে বিদ্যমান বিরোধের ব্যাপারে একটা সমাধানে হয়তো তারা পৌঁছাতে পারবে। কিন্তু ফোনালাপের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রকাশের পর অনেকেই বলছেন যে এ উদ্যোগটি ছিল নিতান্তই একটি লোক দেখানো 'পাবলিক রিলেসন্স গিমিক'বা জনসংযোগের কৌশল।

আমাদের সংবিধানের ৪৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, "রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের (খ) চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার থাকিবে।" উভয় পক্ষের সম্মতি ছাড়া ফোনালাপটি রেকর্ড ও প্রকাশ করার মাধ্যমে নিঃসন্দেহে এক বা উভয় পক্ষের যোগাযোগের গোপনীয়তা সম্পর্কিত মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয়েছে।

এ ছাড়া তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০৬-এর অধীনেও এটি একটি দণ্ডণীয় অপরাধ। আইনের ৬৩(১) ধারার বলা হয়েছে, "এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ কোন কিছু না থাকিলে, কোন ব্যক্তি যদি এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের কোন বিধানের অধীন কোন ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড, বই রেজিস্টার, পত্রযোগাযোগ, তথ্য, দলিল বা অন্য কোন বিষয়বস্তু অন্য কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাহার এই কার্য হইবে একটি অপরাধ?" আর আইনে এই অপরাধের জন্য শাস্তির মেয়াদ করা হয়েছে ৭ থেকে ১৪ বছরের কারাদণ্ড।

আমরা জানি না কে বা কারা ফোনালাপটি রেকর্ড ও প্রকাশ করেছে। তবে অনেকে মাননীয় তথ্যমন্ত্রীর দিকে অঙ্গুলি প্রদর্শন করছেন, যদিও তিনি এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তবে সকল সন্দেহ দূর করার ও সত্যিকারের দোষীকে চিহ্নিত করে আইনানুগ শাস্তি প্রদানের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি তদন্ত অনুষ্ঠানের আমরা দাবী জানাই।

২.

আমাদের দু'টি প্রধান দলের – আওয়ামী লীগ ও বিএনপির – মধ্যেকার বর্তমান বিরোধ মূলত নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা নিয়ে। এ বিরোধের সূত্রপাত হয় ২০১১ সালে, উচ্চ আদালতের একটি রায়ের দোহাই দিয়ে বর্তমান সরকারের একতরফাভাবে সংবিধান থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান বিলুপ্ত করার মধ্য দিয়ে।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯৯৪ সালে ক্ষমতাসীন বিএনপির পক্ষ থেকে মাগুরা উপ-নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ব্যাপক গণআন্দোলনের মুখে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা আমাদের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আওয়ামী লীগ এবং তখনকার তার মিত্র জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী জাতিকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে, দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভবপর নয়। ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ নেতা জনাব তোফায়েল আহমদের ভাষায়, এটি হয়ে উঠেছে একটি 'সেটেল্ড' বা মিমাংসীত বিষয়। তা সত্ত্বেও বর্তমান সংসদ ব্রুট মেজরিটি ব্যবহার করে ব্যবস্থাটিকে বাতিল করে, যদিও বাতিলের সিদ্ধান্তটির 'লেজিটেমেসি' বা বৈধতা এবং 'লিগালিটি'বা আইনসিদ্ধতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন রয়েছে।

অনেকেরই মনে আছে যে, ২০১০ সালের ২১ জুলাই সংসদের উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীকে চেয়ারপার্সন এবং জনাব সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে কো-চেয়ারপার্সন করে মহাজোটের সংসদ সদস্যের মধ্য থেকে ১৫ জনকে নিয়ে সংবিধান সংশোধনের জন্য একটি বিশেষ সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়। বিএনপিকেও কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হতে আহ্বান করা হলেও তারা তা গ্রহণ করেনি।

কমিটি তার ২৯ মার্চ ২০১১ সালের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সামান্য পরিবর্তনসহ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানে বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। কমিটির সভায় সদস্যদের মধ্যে জনাব তোফায়েল আহমদ, জনাব আমির হোসেন আমু, জনাব আব্দুল মতিন খসরু প্রমুখ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করলে যে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে, সে ব্যাপারে সাবধান বাণীও উচ্চারণ করেন। এরপর কমিটির ২৭ এপ্রিল ২০১১ তারিখের সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একটি প্রতিনিধি দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যকালের ওপর সময়সীমা বেঁধে দেয়ার দাবী জানান।

পরবর্তীতে ১০ মে ২০১১ তারিখে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ একটি বিভক্ত (৪-৩) ও সংক্ষিপ্ত আদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে অসাংবিধানিক বলে মতামত এবং সংসদ ইচ্ছা করলে ব্যবস্থাটি আরও দুই টার্মের জন্য তা রাখার পক্ষে পর্যবেক্ষণ দেন। আদালতের এ নির্দেশনা সত্ত্বেও কমিটি ২৯ মে ২০১১ তারিখে দু'টি সামান্য পরিবর্তনসহ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বহাল রাখার জন্য লিখিতভাবে সুপারিশ করে। পরিবর্তনগুলো হল: এর মেয়াদ ৯০ দিন নির্দিষ্ট করে দেওয়া এবং বিদেশি চুক্তি স্বাক্ষরের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা।

এরপর ৩০ মে কমিটি প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয়। পরবর্তীতে ২৫ জুন সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী সংসদে উপস্থাপন করা হয় এবং পাঁচ দিনের মাথায় তড়িঘড়ি করে, আদালতের পূর্ণ রায় প্রকাশ হওয়ার আগেই, বিরোধীদলের অনুপস্থিতিতে একতরফাভাবে সংশোধনীটি পাশ করে। প্রসঙ্গত, এ ধরনের সিদ্ধান্তকে আমেরিকার জাতির পিতাদের একজন – জেমস মেডিসন – 'টিরানি অব দি মেজরিটি' বা সংখ্যাগরিষ্ঠের জুলুমবাজি' বলে আখ্যায়িত করেছেন, যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, সংবিধান হলো 'এমবডিমেন্ট অব দি উইল অব দি পিপল অব বাংলাদেশ', অর্থাৎ 'বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ'। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাংলাদেশি জনগণের অভিপ্রায়ের প্রতিফলন তো দূরের কথা, এমনকি কমিটির ১৫ জন সদস্যের, যাঁদের সবাই মহাজোট সরকারের অন্তর্ভুক্ত, মতামতেরও প্রতিফলন নয়। বস্তুত এটি এক ব্যক্তির – আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর – একক সিদ্ধান্তেরই ফসল। তাই সংশোধনীটির 'লেজিটিমেসি' বা বৈধতা দারুণভাবে প্রশ্নবিদ্ধ।

শুধুমাত্র পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতাই প্রশ্নবিদ্ধ নয়, এর আইনসিদ্ধতা নিয়েও গুরুতর সন্দেহ রয়েছে। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ৭বি ধারা অন্তর্ভুক্ত করে আমাদের সংবিধানের প্রায় এক-তৃতীয়াংশকে অপরিবর্তনযোগ্য করা হয়েছে। সংবিধান বিশেষজ্ঞ মাহমুদুল ইসলামের মতে, এক সংসদ আরেক সংসদের হাত-পা বেঁধে দিতে পারে না (*কন্সটিটিউশ্যানাল ল অব বাংলাদেশ*, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩১)। তাই পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা ও আইনসিদ্ধতা নিয়ে গুরুতার প্রশ্ন থাকায়, ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে সংবিধান থেকে এক চুল না নড়া সম্পর্কিত অনমনীয়তার যৌক্তিকতা অত্যন্ত দুর্বল।

আমরা মনে করি যে, সবার অংশগ্রহণে প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথের বাধা দূর করার জন্য আমাদের প্রধান দু'টি দলের মধ্যে জরুরি ভিত্তিতে সংলাপ ও সমঝোতা হওয়া আবশ্যক। এ লক্ষ্যে বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই দু'টি বিকল্পের কথা ভাবা যেতে পারে।

প্রথমত, মহাজোটের পাঁচজন নির্বাচিত সংসদ সদস্য, ১৮-দলীয় জোটের পাঁচ জন সংসদ সদস্য ও একজন দলনিরপেক্ষ ব্যক্তিকে (যিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করবেন) নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে আমাদের অবসরপ্রাপ্ত সাবেক প্রধান বিচারপতিগণকে নিয়ে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করে ওই কমিটিকে শর্তসাপেক্ষে এই ১১ জন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। শর্তটি হবে যে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কোন সদস্যই নির্বাচনে অংশগ্রহণ বা নির্বাচনী প্রচারণায় লিপ্ত হতে পারবেন না। প্রসঙ্গত, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ রেখে দলীয় ব্যক্তিদেরকে নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হলে সে সরকার সম্পূর্ণ অকার্যকর হবে বলে আমাদের আশঙ্কা।

দ্বিতীয়ত, মহাজোটের পাঁচ জন সংসদ সদস্য, ১৮-দলীয় জোটের পাঁচ জন সংসদ সদস্য এবং দল নিরপেক্ষ পাঁচ জন ব্যক্তির (তাদের একজন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করবেন) সমন্বয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রেও সাবেক প্রধান বিচারপতিদের নিয়ে গঠিত অনুসন্ধান কমিটির ওপর এই ১৫ জনকে চিহ্নিত করার দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। এ বিকল্পের ক্ষেত্রেও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কোন সদস্যই নির্বাচনে অংশগ্রহণ বা নির্বাচনী প্রচারণায় লিপ্ত হতে পারবে না। এ বিকল্পের ক্ষেত্রে অবশ্য নির্দলীয় ব্যক্তিদের উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত করে আনতে হবে। উভয় ক্ষেত্রেই অন্তবর্তীকালীন সরকারের মেয়াদ হবে ৯০ দিন এবং নির্বাচন কমিশনকে সহায়তার বাইরে সরকারের রুটিন কার্যক্রমের মধ্যে নিজেদের তাঁরা সীমাবদ্ধ রাখবেন।

আমরা নিশ্চিত যে, এ দু'টি ছাড়া অন্য বিকল্পের কথাও ভাবা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো – পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে আমাদের প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দলের স্বদিচ্ছা। তবে উভয় পক্ষই এখনও তাদের স্ব স্ব অবস্থানে অনড় এবং কেউই স্বদিচ্ছা প্রদর্শন করছে না। কিন্তু সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে, তাই কালক্ষেপনের কোনো অবকাশ নেই।

৩.

আমাদের সব আলাপ-আলোচনাই যেন আজ নির্বাচনের মধ্যে আটকে গেছে। অবশ্যই দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন যথাসময়ে হতে হবে, সবার অংশগ্রহণে হতে হবে এবং নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবেই হতে হবে। কিন্তু সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন হলেই আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না। নির্বাচনের পরই পরাজিত দল নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তুলতে এবং ফলাফল মেনে নাও নিতে পারে। এমনকি হরতাল ও অবরোধসহ সহিংস আন্দোলনেরও আশ্রয় নিতে পারে। **তাই আমাদের রাজনৈতিক অস্থিরতার স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী সমাধান আজ জরুরি হয়ে পড়েছে।**

আমরা মনে করি যে, স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করার লক্ষ্যে আমাদের দুই প্রধান দলের বাইরেও বৃহত্তর পরিসরে সংলাপ হতে হবে। অন্যান্য রাজনৈতিক দল, ব্যবসায়িক সম্প্রদায়, গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা এ সংলাপে অংশ নিতে পারেন। সংলাপের মাধ্যমে নব্বইয়ের তিন জোটের রুপরেখার আদলে, মোটা দাগে তিনটি ক্ষেত্রে একটি জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টি করতে হবে এবং এই ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি নাগরিক সনদ স্বাক্ষরিত হবে। ঐকমত্যের প্রথম ক্ষেত্রটি হবে – সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা উদ্ভাবন। এটি হবে 'নির্বাচন-পূর্ব' ঐকমত্যের ক্ষেত্র ।

ঐকমত্যের দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি হবে 'নির্বাচনকালীন' সময়ের জন্য একটি আচরণবিধি প্রণয়ন, যা সবাই মেনে চলবে। এটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে নব্বইয়ের তিন জোটের রুপরেখায় অন্তর্ভুক্ত আচরণবিধিটি কাজে লাগানো যেতে পারে। ওই আচরণবিধিতে রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে মোটা দাগে নয়টি অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। অঙ্গীকারগুলো ছিলঃ শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর, সংঘাত পরিহার করার, পারস্পরিক কুৎসা রটানো থেকে বিরত থাকার, সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় না দেওয়ার, প্রশাসনকে প্রভাবিত না করার, সরকারি প্রচার মাধ্যমের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার, সব বিরোধ তাৎক্ষনিকভাবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিরসন করার, নির্বাচনের দিনে সব কারচুপি ও দুর্নীতির অবসান করার, নির্বাচনী ব্যয়সীমা মেনে চলার, নির্বাচনের মাধ্যমে প্রদত্ত গণরায় মেনে নেওয়ার ইত্যাদি।

গত ২৩ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে নির্বাচনকালীন সময়ে মেনে চলার জন্য আরও কয়েকটি বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে অঙ্গীকার আবশ্যক। যেমন, দলগুলো মনোনয়ন-বাণিজ্যে নিয়োজিত হবে না, টাকা দিয়ে ভোট কিনবে না এবং দলের নেতা-কর্মীদের সুপারিশের ভিত্তিতে মনোনয়ন প্রদান করবে। দলগুলোকে সুস্পষ্টভাবে আরও অঙ্গীকার করতে হবে যে, তারা দুর্নীতিবাজ, চাঁদাবাজ, দখলদার, কালোবাজারী, কালো টাকার মালিক, সন্ত্রাসী, ধর্ম ব্যবসায়ী, যুদ্ধপরাধীদের মতো অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের মনোনয়ন দেয়া থেকে বিরত থাকবে। এছাড়াও তারা সব নির্বাচনী আইন-কানুন মেনে চলবে।

ঐকমত্যের তৃতীয় ক্ষেত্রটি হতে হবে 'নির্বাচন-পরবর্তী' সময় সম্পর্কিত। নির্বাচন পরবর্তী করণীয়গুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে হবেঃ (১) সংসদকে সমাজের সর্বক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বশীল সত্যিকারের স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলে ও কার্যকর করে সরকারের স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। (২) গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ রাজনৈতিক দল গড়ে তোলা হবে। (৩) স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারালয় গড়ে তোলার লক্ষ্যে অযোগ্য, অদক্ষ ও পক্ষপাতদুষ্ট বিচারকদের অপসারণ করা হবে। ভবিষ্যতে নিয়োগের জন্য একটি আইন প্রণয়ন করা হবে। নিম্ন আদালতের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সত্যিকার অর্থে বিচার বিভাগকে পৃথক করা হবে। (৪) দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠানকে একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি সর্বাত্বক অভিযান পরিচালনা করা হবে। মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে দক্ষ ও দল নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে পুনর্গঠন ও কার্যকর করা হবে। (৫) প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দক্ষতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার উদ্যোগ নেয়া হবে। (৬) একটি বলিষ্ঠ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করে স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে স্বায়ত্তশাসিত, শক্তিশালী ও কার্যকর এবং প্রয়োজনীয় সম্পদ (যেমন, জাতীয় বাজেটের ৪০ শতাংশ) ও ক্ষমতা এসব প্রতিষ্ঠানের কাছে হস্তান্তর করা হবে। (৭) সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ, রাজনীতিবিদ ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসমপন্ন কমিটি গঠন করা হবে। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতিতে পরিবর্তন (যেমন, সাংসদ ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের নিয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য ইলেকট্রোরাল কলেজ গঠন), সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের পুনর্মূল্যায়ন, রাষ্ট্রপতি পদের মতো প্রধানমন্ত্রী পদের জন্যও দুই মেয়াদ সীমিতকরণ, আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির প্রচলন, সংসদের উচ্চকক্ষ গঠনের বিধান, নারীদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ সংসদীয় আসন সংরক্ষিত করে রোটেশনের ভিত্তিতে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে এগুলো পূরণ করা, গণভোটের বিধান পুনঃপ্রবর্তন ইত্যাদি হতে পারে কমিটির কার্যপরিধির অংশ। কমিটির সুপারিশগুলো সংসদে পাসের পর সেগুলো গণভোটের মাধ্যমে অনুমোদন করা যেতে পারে। (৮) বহুদলীয় গণতন্ত্রের মূল্যবোধের আলোকে রাজনৈতিক দলগুলোর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত এবং পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তথা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তন

আনা হবে। রাজনৈতিক দলগুলো উগ্রবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে আঁতাত করা ও তাদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান থেকে বিরত থাকবে। (৯) গণমাধ্যমের ওপর সব নিবর্তনমূলক বিধি-নিষেধের অবসান ঘটিয়ে এর স্বাধীনতা পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত করা হবে। (১০) ফায়দাতন্ত্র ও হুমকি-ধমকির অবসান ঘটিয়ে দলনিরপেক্ষ সিভিল সোসাইটি গড়ে ওঠার পথকে সুগম করা হবে। (১১) যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করা হবে। (১২) সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রচলিত ব্যবস্থার সংস্কার করে দরিদ্রজন গোষ্ঠীর জন্য মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হবে। জাতীয় সম্পদে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

৪.

বহু বিতর্ক ও কালক্ষেপনের পর সম্প্রতি জাতীয় সংসদ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর কিছু সংশোধনী সম্বলিত একটি আইন পাশ করেছে। আইনটির মাধ্যমে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে। **প্রথমত**, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অযোগ্য করা হয়েছে, যা আমরা সমর্থন করি।

দ্বিতীয়ত, আইনটির মাধ্যমে নির্বাচনী ব্যয়সীমা ১৫ লাখ থেকে বাড়িয়ে ২৫ লাখ টাকা করা হয়েছে। আমরা মনে করি যে, এটি সাধারণ মানুষের প্রতি চরম বৈষম্যমূলক। কারণ এর মাধ্যমে কালো টাকার মালিকরা, যারা অবৈধভাবে কোটি কোটি টাকা নির্বাচনে ব্যয় করে ইতোমধ্যেই আমাদের নির্বাচনী অঙ্গনকে কলুষিত করেছে, বৈধভাবে আরও কালো টাকা ব্যবহার করার সুযোগ পাবে। তাই আজ প্রয়োজন বাড়ানোর পরিবর্তে নির্বাচনী ব্যয়সীমা কমানো।

তৃতীয়ত, আইনটির মাধ্যমে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন চাওয়া ও পাওয়ার ক্ষেত্রে তিন বছরের দলের সদস্যপদ থাকার বাধ্যবাধকতা রহিত করা হয়েছে। তবে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের অবসর গ্রহণের পর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে তিন বছর অপেক্ষা করার বাধ্যবাধকতা বহাল রয়েছে। গণমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, নির্বাচন কমিশনের মতামত ছাড়াই আইনের এ বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমরা মনে করি যে, মনোনয়নের ক্ষেত্রে দলের তিন বছর সদস্যপদ থাকার বাধ্যবাধকতা রহিত করার ফলে রাজনীতিতে বসন্তের কোকিলদের আগমন আরও উৎসাহিত হবে, নির্বাচনে মনোনয়ন বাণিজ্যের বিস্তার ও টাকা দিয়ে ভোট কেনা তথা নির্বাচনে টাকার খেলার আরও বিস্তার ঘটবে এবং রাজনীতিতে ভ্রষ্টাচারিতা ও নীতিহীনতার আরও প্রসার লাভ করবে। এখনই আমাদের সংসদ সদস্যদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ব্যবসায়ী, এই বিধানটি কার্যকর হলে আমাদের মহান জাতীয় সংসদ পুরোপুরি ব্যবসায়ীদের করায়ত্ব হয়ে যাবে। নিঃসন্দেহে এ ধরনের পরিণতি আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য কোনোরূপ ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে না। তাই আমাদের বোধগম্য নয়, কি কারণে বা কার স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে মনোনয়ন প্রাপ্তির জন্য তিন বছর রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ থাকার বাধ্যবাধকতা সংক্রান্ত এ বিধানটি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ থেকে বাদ দেওয়া হলো! এটা কি দল ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে করা হলো?

আমরা আশ্চর্যান্বিত হয়েছি যে, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষতার সাথে জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের হলেও, আইন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি এ ব্যাপারে কমিশনের মতামত গ্রহণ করারও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি এবং কমিশনও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বি মিয়ার ভাষ্যমতে, কমিশনের কর্মকর্তারা কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁরা কোনো মতামত দেননি। বরং তাঁরা সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে আরোপিত তিন বছরের বাধ্যবাধকতা রহিত করার প্রস্তাব দেয়। (*প্রথম আলো*, ৩০ অক্টোবর, ২০১৩) নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, এর দায়িত্ব হলো সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনস্বার্থ সমুন্নত রাখা। কিন্তু আমরা নিশ্চিত নই, আমাদের বর্তমান কমিশন কার স্বার্থে কাজ করে!

গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশন একটি আচরণবিধির খসড়া চুড়ান্ত করেছে। আচরণবিধিতে মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে কোনোরূপ বিধি-নিষেধ থাকছে না, যদিও অন্তর্বর্তী সরকারের মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের দায়িত্ব রুটিন কার্যক্রম পরিচালনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার কথা।

এছাড়াও আচরণবিধিতে 'নির্বাচন-পূর্ব সময়'-এর সংজ্ঞায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিদ্যমান আচরণবিধিতে সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়া থেকে শুরু করে নির্বাচনী ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত সময়কে নির্বাচন-পূর্ব সময় বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। কমিশন এ সংজ্ঞাকে পরিবর্তন করে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার দিন থেকে তা গননা শুরু করার প্রস্তাব করেছে। এ পরিবর্তনের কারণ আমাদের কাছে বোধগম্য নয়। কারণ আমাদের সংবিধানই নির্বাচনী সাইকেলের সময়সীমা ৯০ দিন নির্ধারণ করে দিয়েছে।

লক্ষণীয় যে, বর্তমান সরকার সরকারি অর্থ ব্যয় করে নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছে, যা নির্বাচনে সমতল ক্ষেত্র সৃষ্টির ধারণার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে, এ ধরনের বৈষম্যমূলক প্রচার-প্রচারণা বন্ধ করার ক্ষমতা কমিশনের নেই। আচরণবিধিতে প্রস্তাবিত এ পরিবর্তনটি কি তাহলে এ বক্তব্যের সমর্থনে কমিশনের ক্ষমতা খর্ব করার লক্ষ্যেই প্রণীত? প্রসঙ্গত, সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদে কমিশনকে অগাধ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। *আলতাফ হোসেন বনাম আবুল কাসেম* মামলায় (ডিএল আর ৪৫) সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদের

ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ রায় দেন যে, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে কমিশন আইনি বিধানের সঙ্গে সংযোজনও করতে পারে।

নির্বাচন কমিশনের অগাধ ক্ষমতা থাকলেও, কমিশন যেন তা প্রয়োগে অনিচ্ছুক। গত কয়েকটি সিটি করপোরেশন নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অনেক ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু কমিশন কারও বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিয়েছে বলে আমরা শুনিনি। তাই আচরণবিধি পরিবর্তন করে কোনো লাভ হবে বলে মনে হয় না, কারণ কমিশন নির্বাচনী বিধি-বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো অজ্ঞাত কারণে এ পর্যন্ত কোনোরূপ সদিচ্ছা প্রদর্শন করতে পারেনি।

৫.

সংলাপ নিয়ে বর্তমান অনিশ্চয়তার কারণ হলো যে, নির্বাচনকালীন সরকার ইস্যুতে আমাদের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান অনড় – একদল সংবিধান থেকে একচুল ও নড়বে না, আরেক দল নির্দলীয় সরকার ব্যবস্থা নীতিগতভাবে না মেনে নিলে সংলাপে যাবে না। তাই সংলাপে বসে তাদের আলাপ করার কিছুই নেই বলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে। এ অবস্থার পরিবর্তন জরুরি – এলক্ষ্যে উভয় দলকেই ছাড় দিতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন হবে আমাদের দুই নেত্রীর পক্ষ থেকে প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও সাহসিকতা প্রদর্শন। তাঁরা তা প্রদর্শন করতে না পারলে এবং পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আমাদের বিরাজমান সমস্যার সমাধান না হলে পুরো জাতিকে তার চরম মাশুল দিতে হবে। এর ফলে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আবারও খাদে পড়ে যেতে পারে এবং আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা ব্যাহত হতে পারে, যা হবে জাতির জন্য 'সম্মিলিত আত্মহত্যার' সামিল।

আরেকটি কারণেও বিরাজমান সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোকে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। নির্বাচনকালীন সরকার সম্পর্কিত সমস্যা আমাদের দু'টি রাজনৈতিক দলেরই সৃষ্টি। নাগরিকদের এ ব্যাপারে কোনো ভূমিকাই ছিল না বা নেই। বরং নাগরিকরা দলগুলোর সিদ্ধান্তের শিকার বা ভুক্তভোগী। তাই নাগরিক হিসেবে আমাদের দাবী – দলগুলো যেন দ্রুততার সঙ্গে নির্বাচনকালীন সরকার সম্পর্কিত সমস্যাটির সমাধান করে নাগরিকদেরকে স্বস্তি দেয়। একই সঙ্গে এ দাবিতে আমরা নাগরিকদেরকেও সোচ্চার হওয়ার আহবান জানাই। কারণ নাগরিকরা সক্রিয়, সোচ্চার এবং প্রতিবাদী না হলে রাজনীতিবিদরা এ দাবির প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবেন না।

আমাদের দুই নেত্রী – শেখ হাসিনা এবং বেগম খালেদা জিয়া – অন্তত দুই দুইবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। তাই তাঁদের কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন তাঁরা যেন নিজেদেরকে প্রশ্ন করেন – আর কত? তাঁদের অনড় অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের ১৬ কোটি জনগণকে আর কত ভূগতে হবে। একই সাঙ্গে তাঁরা যেন ভেবে দেখেন, তাঁরা কি 'লিগেসী' বা উত্তরাধিকার রেখে যেতে চান! কী জন্য তারা জনগণের মনে অমর হতে চান!